আমি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

কোয়ান্টাম বুলেটিন

বর্ষবরণ সংস্করণ ১৪২৫

স্মার্ট হোন ॥ ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজে বাঁচুন, পরিবারকে বাঁচান

ফেসবুক
টুইটার
স্ন্যাপচ্যাট
ইনস্টাগ্রাম
সেলফি
ইউটিউব
ওয়েব সিরিজ
টিভি সিরিয়াল
ভার্চুয়াল গেম
অনলাইন শপিং
স্মার্ট টিভি
ইন্টারনেট
ও
স্মার্টফোন
আসক্তি

স্মার্ট হোন। যে সচেতনতা শুরু হয়েছে দেশব্যাপী, এমনকি বিশ্ব অঙ্গনেও–তার সক্রিয় অংশ হোন। সময়ের সাথে থাকুন আপনিও। ফেসবুকসহ সব ধরনের ভার্চুয়াল ভাইরাসের ছোবল থেকে মুক্ত হতে দ্রুত উদ্যোগী হোন। ভালো থাকুন। নিরাপদে রাখুন আপনার সন্তান ও পরিবারকে।

২০০৯ সাল থেকেই ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তিকর দিক সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম বলেছে–ব্যক্তিগত জীবন, মনোদৈহিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক শান্তির জন্যে এক ভয়ানক হুমকি তথাকথিত এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সেই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকেই কোয়ান্টাম দেশজুড়ে শুরু করে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা প্রচারণা।

মাস পেরোতেই প্রমাণিত হলো এ কথার সত্যতা, লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি ও প্রতারণার দায়ে আজ বিশ্বজুড়ে রব উঠেছে 'ডিলিট ফেসবুক'। আমরা বলতে পারি, ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজেকে ও অন্যকে বাঁচাতে এক দশক আগে যে কার্যক্রমের সূত্রপাত করেছিল কোয়ান্টাম–সময়ের প্রয়োজনে তা-ই আজ সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের মানুষ। কারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছেন–ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আজ যেখানে যত অস্থিরতা হিংস্রতা নেতিবাচকতা, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই ভার্চুয়াল ভাইরাস। যা একটু একটু করে ধ্বংস করে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্প্রীতি ও সমমর্মিতার মতো মানবিক উৎকর্ষের চিহ্নগুলো।

গবেষকদের মতে, স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর গেম-ইউটিউব-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকের চেয়েও ভয়াবহ। যাকে গবেষকরা অভিহিত করেছেন 'ডিজিটাল কোকেন' হিসেবে! তাদের মতে, মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, ঠিক একই ঘটনা ঘটে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও। এ আসক্তির শিকার আজ ধনী-গরিব নির্বিশেষে লক্ষ কোটি শিশু-কিশোর-তরুণসহ সব বয়সী মানুষ।

তাই আসুন, জ্ঞানে-উপলব্ধিতে সত্যিকারের একজন আধুনিক মানুষ হয়ে উঠি। নিজে সচেতন হই। যথাসাধ্য সচেতন করে তুলি আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী-সহকর্মীদের। ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে বাঁচাই সন্তান ও পরিবারকে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে। এ সচেতনতার পথ ধরেই সূচিত হোক আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণ। মানবিকতার অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিক প্রিয় বাংলাদেশ।

শিশুরা ঝুঁকিতে

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা (ইউনিসেফ)-এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১১ হাজার ৮২১ জন শিশু-কিশোরদের নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে ইউনিসেফ। অংশগ্রহণকারীদের ৮১.২ শতাংশ বলেছে, তারা প্রতিদিনই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। ১৩ শতাংশ শিশুই স্বীকার করেছে যে, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো না কোনো সময় হয়রানি বা উত্ত্যক্তের শিকার।

তথ্যসূত্র : দ্য ডেইলি স্টার, ৩০ মার্চ ২০১৮

বিশেষজ্ঞদের দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করুন

- পরিবারকে সময় দিন। পরিবারের জন্যে বরাদ্দ সময়ে টিভি-কম্পিউটার-স্মার্টফোনসহ সকল ডিজিটাল ডিভাইস থেকে দূরে থাকুন। সন্তান মা-বাবা ভাইবোন আত্মীয়দের সাথে বাস্তব যোগাযোগ ও একাত্মতা বাড়ান।
- আপনার স্মার্টফোন থেকে ফেসবুক-টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যাবতীয় অ্যাপস আজই ডিলিট করে দিন। পেশাগত/ শিক্ষাগত প্রয়োজনে এসব ব্যবহার করতে হলেও তা করুন শুধু কম্পিউটার/ ল্যাপটপে, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে।
- শিক্ষার্থী জীবনে বিরূপ প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করেছে। যথাযথ উদ্যোগ নিন আপনিও।
- নিজের ও সমাজের কল্যাণে সৎসঙ্ঘে সক্রিয় থাকুন। সমমনা মানুষদের সাথে গড়ে তুলুন প্রত্যক্ষ সামাজিক যোগাযোগ।
- দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার পাশাপাশি সুস্থ জীবন-অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে ঘটবে আপনার আত্মশক্তির জাগরণ–সব ধরনের আসক্তিকে 'না' বলতে পারবেন আপনি।

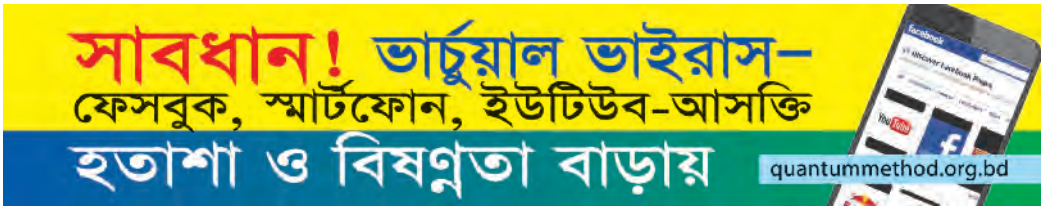

শিক্ষাবিদ, লেখক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন তরুণ প্রজন্ম ও অভিভাবকদের। এ বিষয়ে তার একটি আলোচিত কলামের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

ফেসবুক-ইন্টারনেট আসক্তি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

আপনি একজন বাবা কিংবা মা, আপনার ছেলেমেয়েরা বড় হয় নি, তারা স্কুল-কলেজে পড়ে। একদিন আপনি বাসায় এসেছেন, এসে দেখলেন আপনার ছেলে বা মেয়েটি টেবিলে পা তুলে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা সিগারেট টানছে। আপনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছিস বাবা (কিংবা মা)?'

আপনার ছেলে কিংবা মেয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'সিগারেট খাচ্ছি আম্মু (কিংবা আব্বু)।'

তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, 'খাওয়ার পর একটা সিগারেটে টান না দিলে ভালোই লাগে না।'

কথা শেষ করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল।

আপনি বললেন, 'ঠিক আছে বাবা (কিংবা মা) সিগারেটটা শেষ করে হোমওয়ার্কগুলো করে ফেল।'

কথা শেষ করে আপনি ভেতরে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন : 'আমার ছেলেটি (বা মেয়েটি) কত লক্ষী। বাইরে কোনো ঝুট-ঝামেলার মাঝে যায় না। ঘরের মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায়!'

আমি জানি, আপনারা যারা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের বাবা তারা আমার এই কাল্পনিক দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, একজন বাবা কিংবা মা তার ছেলে বা মেয়ের এরকম একটা আচরণকে কখনো এত সহজভাবে নিতে পারে না।

অবশ্যই নিতে পারে না এবং কখনো নেয় না।

সিগারেট হচ্ছে নেশা। এরকম আরো অনেক নেশা আছে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো দেখে অভ্যস্ত নই। তাই কাল্পনিক দৃশ্যটিতে অন্য নেশাগুলোর কথা না বলে সিগারেটের উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে।

আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

যে বিষয়টি এতদিন একটা সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, এখন সেই বিষয়টি গবেষণা জার্নালে বের হতে শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত একজন মাদকাসক্ত মানুষকে যদি মাদক খেতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুকে আসক্ত একজন মানুষকে যদি ফেসবুক করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে সেই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ছেলেমানুষী বিনোদন নয়, বিষয়টি মাদকে আসক্তির মতো গুরুতর একটি ঘটনা।

কারো কারো কাছে নিশ্চয়ই মনে হতে পারে, আমার পুরো বক্তব্যটা বুঝি একধরনের বাড়াবাড়ি। বিষয়টি মোটেও এমন কিছু গুরুতর নয়। কিন্তু আমি মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি–বিষয়টা যথেষ্ট গুরুতর।

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে সেটা যথেষ্ট রহস্যময়। একজন ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে সেই সময়টাতে সে কীভাবে তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের গঠনটি কেমন হবে। তাই একজন বড় মানুষের ফেসবুক আসক্তি দেখে আমি যতটুকু বিচলত হই তার থেকে অনেক বেশি বিচলিত হই, যদি সেটি হয় কমবয়সী একটি ছেলে বা মেয়ের আসক্তি।

আজ থেকে ১০ বছর পরে হয়তো আমরা জানতে পারব শৈশব-কৈশোরে মাঠে-ঘাটে ছোটাছুটি করে খেলাধুলা না করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ছোট একটা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার কারণে আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুখানি কমনসেন্স হয়তো আমাদের অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

যারা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিকে নিজের কাজে ব্যবহার করছেন আমি তাদের এতটুকু খাটো করে দেখছি না। কিন্তু এই প্রযুক্তি যাদের ব্যবহার করছে, আমার দুশ্চিন্তা তাদের নিয়ে!

সবাই হয়তো জানে না, যারা এই প্রযুক্তি গড়ে তুলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে কোনো একজনকে তাদের ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টালে নিয়ে আসা এবং যত বেশি সম্ভব তাদের সেখানে আটকে রাখা। যারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না তাদের বলব–'বিবিসি'র মতো কোনো সম্ভ্রান্ত একটা নিউজ মিডিয়ার সাইটে যেতে। আশেপাশে তাকান, আপনি কী দেখবেন?

সারা পৃথিবীতে কত গুরুতর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে ওসবের চিহ্ন নেই। একেবারে না দিলেই নয় সে-রকম একটি-দুটি ঘটনার পাশাপাশি শুধু রগরগে চটুল খবর। তার যে-কোনো একটাতে ক্লিক করে দেখেন আপনাকে নিজে থেকে তারা একটার পর একটা ভিডিও দেখাতে শুরু করবে, আপনার মনের জোর যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে কিছু বোঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখে দেখে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করে ফেলবেন।

আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করে আপনাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা সেই ধরনের জায়গায় ঠেলে দেবে! শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করেছেন বলে এই সাইবার জগৎ কিন্তু আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।

'লাইক' দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা সত্যি ঘটনা শুনেছি। একটি বাচ্চা মেয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু একটা পোস্ট করে দিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেখানে কেউ 'লাইক' দেবে। যখন দেখতে পেল কেউ তাকে খেয়াল করে 'লাইক' দিচ্ছে না, তখন সে নিজেই আর একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেকে 'লাইক' দিতে থাকল!

বিষয়টা একটা কৌতুকের বিষয় কিন্তু তারপরও এটা শুনে আমি কেন জানি একটু আহত অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে কেন আমার দেশের একটি ছোট মেয়ে জীবনের প্রতি এরকম একটা দীনহীন মনোভাব নিয়ে কাঙালের মতো বড় হবে? কে ঠিক করে দিয়েছে জীবনকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ফেসবুকে 'লাইক' পেতে হবে?

কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক ইন্টারনেট আসক্তি কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, ফেসবুক আসক্তি একটি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়। আমি তাই সবাইকে মনে করিয়ে দেই, অনলাইন জীবনের পাশাপাশি যে রক্তমাংসের বাস্তব জীবনটি আছে সেটি যেন আমরা ভুলে না যাই।

তথ্যসূত্র : বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম
২৪ মার্চ ২০১৭

আমাদের সন্তান কোনো একটা নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা দুশ্চিন্তিত হবো, বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

ভার্চুয়াল বিপদ সত্য জানুন

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কখন যে আপনি আসক্ত হয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না। হুঁশ ফিরবে যখন, ততক্ষণে শরীর-মন আর পরিবারে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ফিরে পাবেন না আপনার ক্ষয়ে যাওয়া মেধা-সময়-অর্থ। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্তগুলো এমনটাই বলছে। আসুন, জেনে নিই বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় উঠে আসা তথ্যগুলো :

প্রিয়জনের চেয়েও প্রিয় স্মার্টফোন!

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইন্ড ব্রেন বিহেভিয়ার ও সায়েন্স অব হ্যাপিনেস ও টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা *মটোরোলা*-র যৌথ উদ্যোগে একটি জরিপে দেখা গেছে, ৬৫ শতাংশ ভারতীয় তরুণদের কাছে প্রিয়জন বা ঘনিষ্টজনের চেয়েও প্রিয় হলো তাদের স্মার্টফোনটি! এমনকি এটি সাথে না থাকলে বা হারিয়ে ফেলার ভয়ে প্রায়শই তারা ভীষণ অস্থিরতা-আতঙ্কে ভোগেন। এতে আরো বলা হয়, স্মার্টফোন-আসক্তরা ক্রমশ জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

বিশ্বজুড়ে হুমকির মুখে শিশুরা

২০১৬ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি অঙ্গরাজ্যে কিন্ডারগার্টেন থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত জরিপ করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের লেখার প্রতি আগ্রহ দিন দিন কমে টাইপিং শেখানোর প্রবণতা বেড়েছে। ফলে তৃতীয় শ্রেণির শিশুদের হাতের লেখা শেখাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। *(ডয়েচে ভ্যালে, ১ নভেম্বর ২০১৩)*

যেসব শিশুরা দিনে তিন ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিনের সামনে কাটায় তারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে আছে। ২০০৪-২০০৭ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের তিনটি শহরের নয় থেকে দশ বছর বয়সী সাড়ে চার হাজার শিশুদের নিয়ে গবেষণাটি করেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর একদল বিশেষজ্ঞ।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ১৫ মার্চ ২০১৭)

অনলাইন ও ভিডিও গেম ॥ মেধাশূন্য ও আগ্রাসী হয়ে উঠছে তরুণেরা

ভিডিও গেম খেলার সময় ব্যক্তির মনে হয়, গেমের জগতটাই বাস্তব, এখানকার সবকিছু সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। গেমে আসক্ত ব্যক্তি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বোঝে না–সে সাজানো নাটকের অংশমাত্র। এ কথাগুলো বলেছেন আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল।

আঁতকে ওঠার মতো একটি ঘটনা ঘটে ২০১০ সালে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক দম্পতি অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে সারাদিন সাইবার ক্যাফেতে পড়ে থাকত। একপর্যায়ে গেমের মধ্যে কাল্পনিক একটি শিশুকে নিয়ে তারা এতই মনোযোগী ছিল যে, বাস্তবে নিজেদের তিন মাস বয়সী সন্তানকে দিনে খাবার দিত মাত্র একবার। অনাহারে-অযত্নে শেষপর্যন্ত মারা যায় ছোট্ট শিশুটি। *(সিএনএন, ৫ মার্চ ২০১০)*

জার্মানির মিউনিখে ১৮ বছরের এক তরুণ অতর্কিত হামলা চালিয়ে নয় জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় সে ছিল সহিংস গেমে আসক্ত। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, সহিংস গেমগুলো কিশোরদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলছে।

(টাইম ম্যাগাজিন, ১৭ আগস্ট ২০১৫)

সোশ্যাল মিডিয়া ॥ মাদক এবং জুয়ার চেয়েও আসক্তিকর

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এমন ১৪-২৪ বছর বয়সী ১৫০০ জন তরুণ-যুবক এতে অংশ নেয়। দেখা যায়, এদের শতকরা ৯১ জনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এতটাই আসক্ত, যা সিগারেট বা অ্যালকোহলে আসক্তির চেয়েও বেশি।

বিশেষত ছবি শেয়ারিং অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রভাব ফেলছে। প্রতি পাঁচ জনে একজন তরুণের ভাষ্য হচ্ছে, তারা মাঝরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো নতুন মেসেজ এলো কিনা তা চেক করে, যার ক্লান্তি পরদিন সারাক্ষণই তারা বয়ে বেড়ায়।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ২১ মে ২০১৭)

জার্নাল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট: ডিজঅ্যাবিলিটি এন্ড ট্রমা-তে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন।

ছবিতে লাইক পাওয়ার আগ্রহ মস্তিষ্কে নিঃসরণ করে ডোপামিন নামক হরমোন। ড্রাগ গ্রহণের সময় বা জুয়ায় জিতলে মস্তিষ্কে এই একই হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। *(দ্য সান, ৬ জুলাই ২০১৬)*

নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত কৈশোর ॥ পরিণতি হতে পারে আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষণ্ণতায় ভোগা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা বেড়ে গেছে। পরবর্তী পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

(হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর ২০১৭)

গুরুতর মানসিক রোগ 'সেলফিটিস' সেলফি নিষিদ্ধ হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে

ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্যে ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয় (ট্রেন্ডি), তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত।

(দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

চলচ্চিত্র-বিষয়ক বিশ্বখ্যাত আয়োজন ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসব। অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবছর অনুষ্ঠিতব্য এর ৭১ তম আয়োজনে সেলফি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসবের প্রধান আয়োজক থিয়েরি ফ্রামোঁ-র মতে, সেলফি একটি ব্যাধি, যা সত্যিই উদ্ভট ও ভীতিকর।

(দ্য গার্ডিয়ান, ২৪ মার্চ ২০১৮)

সাইবার বুলিং ॥ নৃশংসতার নতুন ফাঁদ

অনলাইনে অশালীন কথা ও ছবি, অকথ্য গালিগালাজ, এমনকি হত্যার হুমকির নামই সাইবার বুলিং। আমাদের দেশেও ঘটছে এ ধরনের ঘটনা।

ঢাকার উত্তরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া পাঁচটি গ্রুপের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। পারস্পরিক বিবাদ প্রথমে ফেসবুকে অশোভন ভাষায় হুমকি দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় বাস্তব নৃশংসতায়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি একটি গ্যাং-এর কিশোররা খুন করে তাদেরই সহপাঠীকে।

দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে চোখ-কান ও মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

ম্যাসাচুসেটস-এর চোখ-কান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিজনিত সমস্যা এবং মাথাব্যথার রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

(দ্য বোস্টন গ্লোব, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬)

দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে স্মার্টফোন ব্যবহারে ঘাড়ে ক্রমাগত চাপ পড়ে। এ চাপের পরিমাণ একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ। ফলে স্মার্টফোন আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে 'টেক্সট নেক' নামক ঘাড়ব্যথায়।

আবার আমেরিকার ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণও হচ্ছে দীর্ঘসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে থাকা। *(নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ জানুয়ারি ২০১৮)*

সচেতন হওয়ার দায়িত্ব আপনার

একজন সাধারণ ব্যবহারকারীও দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্টফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তা-ই নয়, স্মার্টফোনের স্ক্রিন টাচ করে দিনে অন্তত দু-হাজার বার।

(দ্য গার্ডিয়ান, ১১ নভেম্বর ২০১৭)

প্রিয় পাঠক, ভার্চুয়াল জগতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সত্যটা তো জানলেন। এবার সচেতন হওয়ার পালা। এ দায়িত্ব একান্তই আপনার।

প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয়

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মোবাইল ফোন জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া ভালো না। আজকাল ফেসবুক-গেমস ইত্যাদি নিয়েই সময় কাটায় সবাই।

পরিবারে কেউ কারো সাথে কিছু শেয়ার করতে চায় না। এতে একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে। ইতিবাচকতা ও মানবকল্যাণে লাগানোর মধ্য দিয়েই প্রযুক্তির সার্থকতা নিহিত। এ প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

[খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ, ৪ এপ্রিল ২০১৮]

ফেসবুক নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অধিকাংশ মানুষ বিশেষত তরুণরা এখন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। আজ পরিবারগুলোও বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মম শিকার।

একটা সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে সবাই মিলে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের যোগাযোগ নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ।

[শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যে আসক্তির কারণে কমে যাচ্ছে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

এখনকার বাচ্চারা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায়। রাত জেগে টিভি দেখাটা সে শিখছে বাবা-মা ও পরিবারের বড়দের কাছ থেকে। কম ঘুমের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে মেদস্থূলতা, চোখ-কানেরও ক্ষতি হচ্ছে। লেখাপড়াতেও তাদের মনোযোগ কমে যাচ্ছে। স্মার্টফোনসহ এ ধরনের সকল প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

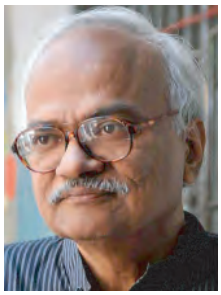

শিশুদের নিয়ে ৪১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি–সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, সে চায় দৃষ্টান্ত। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে।

মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য।

[কবি, লেখক ও কলামিস্ট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

তরুণদের ২৪ ঘণ্টাই আসক্ত করে রাখছে স্মার্টফোন

অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ

মাদকাসক্তরা সাধারণত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মাদক গ্রহণ করে। কিন্তু স্মার্টফোন-ইন্টারনেট-ফেসবুক আসক্তি ২৪ ঘণ্টাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। এতে আসক্তরা কর্মক্ষেত্রে, খাবার টেবিলে, এমনকি টয়লেটে গিয়েও স্মার্টফোন চালাতে থাকে।

আমি মনে করি, ১৮ বছর বয়সের আগে কেউ স্মার্টফোন পেলে এর অপব্যবহার বেশি হবে। এসব থেকে বাঁচতে হলে সন্তানকে ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুরু করতে হবে। এছাড়াও মেডিটেশন চর্চা তরুণ প্রজন্মকে ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

[বিভাগীয় প্রধান, মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিভাগ, শাহাব উদ্দিন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

স্মার্টফোন-ফেসবুক আসক্তিতে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

স্মার্টফোন ও ফেসবুক আসক্তি তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে চলেছে। এতে তাদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। আমি মনে করি, অন্যান্য রোগের মতো এসবে আসক্তিও এক ধরনের রোগ, যার চিকিৎসা প্রয়োজন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কোয়ান্টাম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন]

আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না, তবে শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না–কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে রাতে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না! এভাবে নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, সচেতনতা বাড়ে নি। এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

[মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ কালে আমাদের অর্জন অনেক–এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনতত্ত্বের অধ্যাপক ও লেখক। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো

আসাদুজ্জামান নূর

আমার বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে। রোজ সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা টানতে টানতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার পিঠে বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী যে, বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিনতলা বাড়ি–ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এখন এই হলো একটা শিশুর জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেল দেখায় ব্যস্ত। এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্য না হয়ে অমানুষের জন্য হতে পারে! কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

[কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর]

গ্যাং কালচার শেখায় গেমস

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

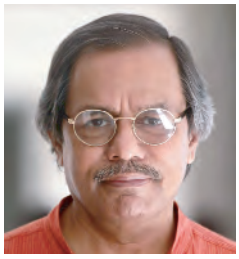

বর্তমান পরিস্থিতির দায় প্রথমত পরিবারের, দ্বিতীয়ত শিক্ষাব্যবস্থার। পরিবারগুলোর চিন্তা এখন বৈষয়িক উন্নতিকেন্দ্রিক। এতে করে দুর্নীতির বিশাল বিস্তার ঘটেছে এবং পরিবারগুলো নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এর একটা প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়ছে। সনদনির্ভর লেখাপড়া শিশুদের বিনোদন বা অবসর দিতে পারে না। তারা গেমস খেলে বা ফেসবুক ব্যবহার করে। গেমস গ্যাং কালচার শেখায়, খেলার মাঠে দলের যে ধারণা তৈরি হয় তা শেখায় না।

[৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ 'নৃশংসতার চর্চা বাস্তবে, ভার্চুয়াল জগতে' শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় দৈনিক প্রথম আলোতে। সম্প্রতি ঢাকার উত্তরায় কিশোরদের গ্যাং কালচার-এর দৌরাত্ম্য এবং নৃশংসতার প্রসঙ্গে একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম]

১৬ বছর বয়সের আগে মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার শুধু বিপজ্জনক নয়, এর চেয়েও বেশি কিছু। মোবাইলে ১৫ মিনিট কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়ে, শিশুদের ক্ষেত্রে আরো বেশি। তাই ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনোভাবেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

দেশে এখন থাইরয়েড ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোকালয়ে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ। কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

আধুনিক গ্যাজেট ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের অন্তরায়

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার

নবজাতকের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটে। আর এভাবেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়। যোগাযোগের সুবিধার্থে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয় প্রায় ৭০০টি সিন্যাপস। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ফলাফল ভালো না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ওপর।

তাই শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন পরিবেশের যথাযথ উদ্দীপনা ও সাড়া দেয়ার সুযোগ। যেমন : শিশু যখন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলী হয় তখন পরিবারের সদস্যরা সেটির সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু টিভি, মোবাইল ফোন, ট্যাব শিশুকে একতরফা কিছু উদ্দীপনা দিতে থাকে–যেখানে শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বা ভাবের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। এটি তার মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। এতে শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক ইউনিটের প্রধান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

সন্তানকে প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে শতবার চিন্তা করুন

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী

বর্তমানে অধিকাংশ মা-বাবাই শিশুকে ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখিয়ে খাবার খাওয়ান। এতে করে শিশুটি কী খাচ্ছে, খাবারটির স্বাদ-গন্ধ কেমন, রঙের তফাৎ কতটা–কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সাধারণত শিশু খাবার মুখে নিয়ে প্রথমেই এর স্বাদ বোঝার চেষ্টা করে। পাকস্থলী এবং হজম প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সব অর্গান এসময় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনমতো পাচক রস নিঃসরণ করে। ফলে খাবার সঠিকভাবে হজম হয়।

অথচ শিশুটি ভিডিও দেখে খেতে অভ্যস্ত হলে তার মনোযোগ থাকে টিভি বা স্মার্টফোনের দিকে, খাবারের দিকে নয়। এভাবে চলতে থাকলে তার হজম প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যায়। সন্তানকে কোনো প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে অভিভাবকদের শতবার চিন্তা করতে হবে, এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্টফোন আর এ ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তাভাবনা করার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম না করি, দৌড়াদৌড়ি না করি তাহলে হাত-পায়ের পেশি সবল হবে না। তেমনি আমরা যদি চিন্তা না করি, তাহলে মস্তিষ্কও সবল হবে না। আমরা যদি মোবাইলে কথা বলায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে চিন্তাশক্তি কখনো বিকশিত হবে না।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দেখা করা, অনুভূতির আদান-প্রদান, সবকিছুই এখন মোবাইলে আর ইন্টারনেটে। এগুলো অর্থেরও অপচয়। এ যুগে তরুণদের অনেকের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। তাই স্মার্টফোনসহ প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

আসক্তি মুক্তির অভিজ্ঞতা

ভার্চুয়াল ভাইরাস মুক্ত হতে সম্প্রতি উদ্যোগী হতে শুরু করেছেন চারপাশের সচেতন মানুষ। ব্যক্তিভেদে আসক্তির মাত্রা ও ভোগান্তি যেমন আলাদা, তেমনি বৈচিত্র্যময় একেকজনের আসক্তি মুক্তির পদক্ষেপ। এ পথে কখনো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা; কখনো স্রোতের বিপরীতে উদ্যোগী হতে হয়েছে নিজেকেই। ভার্চুয়াল ভাইরাস নামের প্রবল এ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, এমনই কয়েকজন কোয়ান্টাম সদস্য জানিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা।

আমি আসক্ত নই, তাই দৃঢ়তার সাথে সন্তানদের বলতে পারি

আমার ছেলে এখন কলেজে পড়ে। সে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ফেসবুক ও ভার্চুয়াল গেম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকত, পরিবারের কারো সাথে সেভাবে কথাও বলত না। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। একসময় লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করল। কিছু বললে রাগ করত, মারমুখী হয়ে যেত।

ছেলের এ পরিবর্তন আমাকে খুব কষ্ট দিত, দুঃশ্চিন্তাও করতাম। এর মধ্যে কোয়ান্টামের এক প্রোগ্রামে গুরুজীর আলোচনায় অটোসাজেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। I can I will এই অটোসাজেশনটি চর্চা করে লেখাপড়ায় সাফল্য পেয়েছে, এমন দুই বোনের ঘটনা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হলাম সেদিন। মনে হলো, ছেলেকে আবার সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাকেও এ চর্চাগুলো করতে হবে ও প্রো-একটিভ হতে হবে।

আমি প্রতিদিন ঘুমানোর সময় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম, ভালো ভালো কথা বলতাম, কোরআন পড়ে শোনাতাম, সবসময় I can I will বলতে উদ্বুদ্ধ করতাম। ছেলের জন্যে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখতাম। সাধ্যমতো সদকা হিলিংয়ে নাম দেয়া ও কোরআন মর্মবাণী বিতরণ চলতে থাকল। আমি প্রতি শুক্রবার সপরিবারে সাদাকায়নে যেতাম। সন্তানকে নামাজ ও মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতাম।

ছেলের সাথে কখনো রাগারাগি বা ঝগড়ায় যেতাম না, কৌশল অবলম্বন করতাম। কোনো অন্যায় করে সে ধরা পড়লে এবং অনুতপ্ত হলে কঠোর না হয়ে তাকে শোধরানোর সুযোগ দিয়েছি। ভালো অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করায় প্রশংসা করেছি।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে আমার ছেলে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত এবং সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কী কী করতে হবে তা সে পড়ার টেবিলের সামনে বোর্ডে লিখে রেখেছে। সারাদিনের একটি রুটিন তৈরি করেছে এবং তা অনুসরণ করছে।

সন্তানকে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে আমার দেড় বছর সময় লেগেছে। আর এ কাজটি সহজ হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত, কোয়ান্টামের আত্ম উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজে আমি যুক্ত থেকেছি। ফলে সবসময় বিশ্বাস করতে পেরেছি– আমি পারব। দ্বিতীয়ত, টিভি সিরিয়াল, ফেসবুক, আড্ডা–এ ধরনের কোনো আসক্তি আমার নেই। এজন্যে সন্তানদেরও আমি ভালো কাজের কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি। কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্যে।

সন্তানদের ফেসবুক থেকে দূরে রাখতে কুশলী হয়েছি

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজন আছে ভেবেই বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছিলাম। সন্তানরা কম্পিউটার নিয়ে প্রায় সারাদিন পড়ে থাকছে দেখেও আমি সেভাবে গুরুত্ব দেই নি। পরবর্তীতে কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে জানতে পারলাম এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে। সচেতন হলাম এবং বুঝতে পারলাম বাসায় ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি হচ্ছে।

একদিন বাসায় ফিরে বেশ কঠোরভাবে বললাম যে, এ বাসায় হয় ইন্টারনেট থাকবে বা আমি থাকব। খুবই বিস্মিত হলাম যখন আমার বাচ্চারা বলল– 'ইন্টারনেট লাইন থাকবে, তুমি বাসা থেকে বের হয়ে যাও।' বুঝলাম, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং পরিবারের সাথে লড়াই করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম, জোর করে সন্তানদের সাথে সুবিধা করতে পারব না, আমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

সমস্যা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না করে আমি সমাধানের দিকে মনোযোগী হলাম। প্রথমেই যোগাযোগ করলাম আমাদের ইন্টারনেট সংযোগ অপারেটরদের সাথে। তাদেরকে বললাম, আমার বাসায় ইন্টারনেটের স্পিড কমিয়ে দিতে। একই পরিমাণ বিল দিতে আমি রাজি, কিন্তু ফেসবুক-ইউটিউব চালানোর মতো স্পিড যেন না থাকে।

এ কৌশল অবলম্বন করার পর দেখলাম, বাচ্চারা ইন্টারনেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। দুই মাসের মধ্যে তাদের অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার কমে গেল।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বুলেটিন, ফোল্ডার, স্টিকার বিতরণ করার ও ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান– bulletin@quantummethod.org.bd

এখন আমি সময়কে কাজে লাগাতে পারছি

সামাজিকতা রক্ষার নাম করে আমি সারাদিন ফেসবুকিং করতাম। এটা কীভাবে একজন সামাজিক মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, সেটা আমি বুঝতাম না। তবে আমি বলব, আমার এ অভ্যাসের ক্ষেত্রে মা-বাবার মৌন উৎসাহ ছিল। সমাজের অধিকাংশ মা-বাবার মতো তাদেরও ধারণা ছিল, ছেলে বাইরে গিয়ে অন্যদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং মোবাইল-কম্পিউটার নিয়ে ঘরে থাকুক। সন্তান চোখের সামনে আছে, তার মানেই ভালো আছে।

এভাবেই ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া আমার জীবনের অংশ হয়ে গেল। ফেসবুকে সময় নষ্টের বিষয়টা সবসময় আমার চোখ এড়িয়ে যেত।

যখন কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিতে শুরু করলাম, দেখতাম কোয়ান্টাম খুব জোর গলায় বলছে ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক নিয়ে। ফেসবুক-ইন্টারনেট কীভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করছে, মূল্যবান সময় নষ্ট করছে, সে-সম্পর্কে কোয়ান্টামের অনেক লেখা পড়লাম। তারা বলছে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে দূরে থাকলে আপনি ভালো থাকবেন, জীবন সুন্দর হবে।

প্রথমদিকে এ কথাগুলো আমাকে সেভাবে প্রভাবিত করে নি। কখনো কখনো ব্যবহার কমিয়েছি কিন্তু ফেসবুক পুরোপুরি বন্ধ করি নি। কিন্তু এবছর ভার্চুয়াল ভাইরাস স্টিকার ক্যাম্পেইনের সময় আমার মনে হলো, একবার চেষ্টা করেই দেখি। ফেসবুকের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাদেরকে বললাম, আমাকে ফেসবুকে পাবে না। খুব জরুরি হলে ফোন করবে।

> ফেসবুক না থাকাতেই বরং আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুদের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো হতে শুরু করেছে।

ফেসবুক বন্ধ করার পর প্রথমদিন আমার সাধারণভাবেই কেটে গেল, করার কিছু পাচ্ছিলাম না বলে বই পড়তে শুরু করলাম। রাতে দীর্ঘসময় ফেসবুকে বসে থাকা নেই, তাই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন অবাক হয়ে দেখলাম, আমি ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে গেছি এবং অনেকদিন পর ফজরের নামাজ পড়লাম।

এভাবে তিন দিন যেতে না যেতেই আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হতে লাগল ফেসবুকে লগ ইন করার–'আমার বন্ধুরা কী করছে? তারা কোথায় বেড়াতে গেল কিনা? কারো নতুন কোনো খবর আছে কিনা? আড্ডার নতুন টপিকটা মিস করলাম নাকি? নিউজ ফিডের নিউজগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে! অন্যদের সাথে আমার সম্পর্কগুলো তো হালকা হয়ে যাচ্ছে।' মাথায় এমন নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল।

আবার একইসাথে বিপরীত চিন্তাও আসতে লাগল। কেন আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারছি না? ফেসবুক কি আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ? একসময় উপলব্ধি করলাম আমি আসলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যেভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ করে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্ককে, ঠিক সেভাবে ফেসবুকও নিয়ন্ত্রণ করছে আমাকে। তখন আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠলাম আমি।

ফেসবুক বন্ধ করার পর আমার জীবন অনেক সুশৃঙ্খল হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় যেসব কাজ আমি করব করব বলে ভাবতাম কিন্তু করা হতো না, এখন অনায়েসেই সে কাজগুলো করতে পারছি। প্রতিদিন ঠিকমতো খাওয়া, পড়ালেখা, পর্যাপ্ত ঘুম, মেডিটেশন, ব্যায়াম, পরিবারের কাজে সহযোগিতা করাসহ অনেক কিছু করা যায়। এখন আমি সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ফেসবুক না থাকাতেই বরং বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনদের সাথে আমার সম্পর্ক আরো ভালো হতে শুরু করেছে। আর এসব সম্ভব হলো ছোট্ট একটি সিদ্ধান্তের কারণে– আমি আর ফেসবুক ব্যবহার করব না।

মনোযোগ লুটের অর্থনীতি

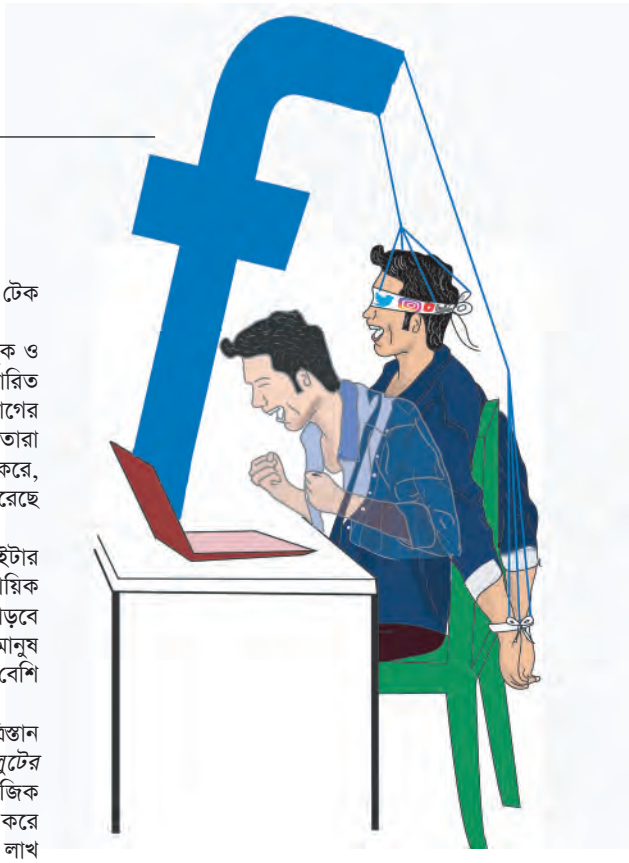

আপনার স্মার্টফোনটির কল্যাণে গুগল ম্যাপের মতো কোম্পানিগুলো খোঁজ রাখে আপনি কোন রেস্তোরায় খেতে যান, কোন শপিং মলের কোন দোকান থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করেন। আবার ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো জানে, আপনার বন্ধু কারা, তাদের সাথে কোন বিষয়ে কথা বলতে আপনি আগ্রহী, কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার আড্ডার রসদ পান।

একজনের ওয়েবসাইট ভিজিটের তথ্য মিলিয়ে তার দৈনন্দিন অভ্যাসের প্রোফাইল তৈরি করা টেক কোম্পানিগুলোর জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার। যেহেতু দৈনন্দিন কাজের বেশিরভাগই আমরা করি অভ্যাসচক্রের অংশ হিসেবে, তাই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা না হয়েও বলতে পারে, কী হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড!

ফেক ব্লগ ও ওয়েবসাইট তৈরি করে তারা বাধ্যও করতে পারে ব্যক্তিকে তাদের বেছে দেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কীভাবে? যেমন, চ্যাটিং-এর সময় বন্ধুকে আপনি জানালেন ইদানীং বেশ দুর্বল লাগে। এরপর হঠাৎ দেখলেন, আপনার নিউজফিডে *দুধের চেয়ে শক্তিদায়ক* খাবারের বিজ্ঞাপন আসছে। প্যাকেটজাত খাবারের চেয়ে দুধ যে স্বাস্থ্যকর, তা আপনি জানেন। কিন্তু কয়েকদিন বিজ্ঞাপন দেখার পর আগ্রহবশত ইন্টারনেটে সেরা দশ স্বাস্থ্য-বিষয়ক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করলেন। এরপর সেরা দুটো ওয়েবসাইটে সেই খাবারের গুণাগুণ পড়ে সেটা কিনলেনও।

আপনি মনে করছেন, আপনি খাবারটি কিনছেন দেখে-শুনে। কিন্তু সত্য হলো, আপনি কিনছেন টেক কোম্পানিগুলোর সাজানো ফাঁদে পা দিয়ে।

ঠিক এভাবেই কেমব্রিজ এনালিটিকা, ফেসবুক ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে পণ্য কিনতে; এমনকি ভোটাধিকার প্রয়োগের বেলায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ কোটি ভোটারকেও তারা প্রভাবিত করেছে এভাবেই। ফেক ব্লগ তৈরি করে, ফেক আইডি থেকে গুণকীর্তন করে প্রতারিত করেছে ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে।

কারণ ফেসবুক, ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট, টুইটার প্রভৃতি কোম্পানিগুলোর আয়ের উৎস ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া বিজ্ঞাপন। যত বেশি বাড়বে ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং যত বেশি সময় মানুষ কাটাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, তত বেশি বিজ্ঞাপন সে পাবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে।

গুগলের সাবেক ডিজাইন নীতি-নির্ধারক ত্রিস্তান হ্যারিস একে ব্যাখ্যা করেছেন *মনোযোগ লুটের অর্থনীতি* হিসেবে। ২০১৭ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এ কৌশল প্রয়োগ করে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা মাত্র!

সিএনএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকানরা দিনে গড়ে প্রায় ১১ ঘণ্টা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যয় করে। অর্থাৎ ঘুম বা কাজের চেয়ে বেশি সময় তারা সেঁটে থাকে ডিভাইসের স্ক্রিনের সাথে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় পুঁজিপতিরা।

বিনোদন প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স-এর প্রধান নির্বাহী রিড হ্যাস্টিংস বলেছেন, 'ফেসবুক বা ইউটিউব নয়। আমাদের প্রধান প্রতিযোগী মানুষের ঘুম।' বর্তমানে প্রতি তিন জনে একজন আমেরিকান অনিদ্রায় ভোগে, তারপরও এমন বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়– এ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সেবা (!) দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র : বিবিসি, ৩০ মার্চ ২০১৮ ও এইচবিও-তে প্রকাশিত ত্রিস্তান হ্যারিসের সাক্ষাৎকার, ২ জুন ২০১৭

আপনি কতটা আসক্ত?

ড. কিম্বারলি ইয়াং। ইন্টারনেট আসক্তি বিষয়ে বিশ্বের প্রথমসারির একজন বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৫ সালে তিনি আমেরিকায় সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যাডিকশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্ভাবিত প্রশ্নমালা অনুসারে জেনে নিন ইন্টারনেটে আপনি কতটা আসক্ত—

উত্তর	না	কদাচিৎ	মাঝে মাঝে	প্রায়ই	সবসময়
স্কোর	১	২	৩	৪	৫

- কখনো কি মনে হয় প্রয়োজনের বেশি সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করেন?
- পরিবারকে সময় দেয়ার চেয়ে ইন্টারনেট চালাতে বেশি পছন্দ করেন?
- কাজ বা পড়াশোনা কি ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে প্রায়ই বিঘ্নিত হয়?
- 'ইন্টারনেটে এতক্ষণ কী করেন?' এর উত্তরে কি সত্য বলতে পারেন?
- দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার চেয়ে কি সোশ্যাল মিডিয়ায় অলস সময় কাটাতে ভালো লাগে?
- অফলাইন বা কাজের সময় কি প্রায়ই মনে হয়, কখন অনলাইন হবো?
- রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে ক্লাসে বা অফিসে কি প্রায়ই আপনার ঘুম পায় বা ক্লান্তিবোধ করেন?
- সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা অবস্থায় কি মনে হয় 'আর মাত্র কয়েক মিনিট' কিন্তু বের হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়?

স্কোর ৮-১৮ : স্বাভাবিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

স্কোর ১৯-২৯ : ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার মাঝে মাঝে আপনার স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়। এখনই সময় সচেতন হওয়ার।

স্কোর ৩০-৪০ : আপনি আসক্ত। ইন্টারনেট আপনার জীবন থেকে কী নিচ্ছে, তা ভালোভাবে পর্যালোচনা করুন। বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করুন, ব্যবহারের মাত্রা ঠিক করুন।

ওদের পৌষমাস আমাদের সর্বনাশ

কোটি কোটি শিশু-কিশোর-তরুণের মস্তিষ্কের চূড়ান্ত সর্বনাশ করলেও প্রযুক্তি-উদ্ভাবকরা ঠিকই আগলে রাখেন নিজ সন্তানদের। অ্যাপলের কর্ণধার স্টিভ জবস কখনো সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেন নি। ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিহাপিতিয়া সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরুদায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তিনি এ-ও বলেছেন, My kids are not allowed to use that shit.

ফেসবুক পোস্ট/ ছবিতে 'লাইক' পাওয়ার জন্যে মানুষ কত উদ্ভট কাণ্ডই না করে! এই লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে সযত্নে *লাইক* বাটনটি সরিয়ে দিয়েছেন আসক্ত হয়ে পড়ার ভয়ে। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও ইভান উইলিয়ামসের দুই শিশুপুত্র আইপ্যাডের জন্যে বহু আবদার করলেও তিনি নাকচ করে দেন। আইপ্যাডের বদলে ওদের তিনি কিনে দিয়েছেন কয়েকশ বই।

শৈশবেই কম্পিউটার ও স্মার্টফোন জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সৃজনশীলতা, মনোযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। গুগল অ্যাপল ইয়াহু-র এক্সিকিউটিভরা এ সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাদের কয়েকজন স্বীকার করেছেন, তেল ও জলের মতো লেখাপড়া ও কম্পিউটারও মিশ খায় না। তাই সন্তানদের এমন স্কুলে পাঠান যেখানে কম্পিউটার-স্মার্টফোন-ট্যাবের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা একটি সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তা হলো– ক্লাসরুমেও ছাত্রছাত্রীরা মোবাইলে মেসেজ চালাচালি করছে। টিফিনের বিরতিতেও খেলাধুলায় আগ্রহ নেই। আসক্তের মতোই তারা ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল জগতে। এ সমস্যার বিহিত করতে না পেরে ফ্রান্স ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮

ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার ॥ শিশুদের জন্যে গাইডলাইন

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস। ২০১৬ সালে তারা শিশুদের সুরক্ষায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করা উচিত।

বয়স ১৮ মাস বা এর কম

কোনো প্রকার স্ক্রিন নয়

বয়স দেড় থেকে দু'বছর

শুধু শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম

বয়স তিন থেকে পাঁচ বছর

দিনে সর্বোচ্চ একঘণ্টা

দেখার সময় মা-বাবা সাথে থাকুন

ছয় বছরের বেশি

ব্যবহার সীমিত করুন। স্ক্রিন যেন ঘুম ও খেলাধুলাকে ব্যাহত না করে।

ফেসবুককে 'না' বলুন

বিশ্বজুড়ে ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন এখন রূপ নিয়েছে গণসচেতনতায়। সম্প্রতি তথ্য-নিরাপত্তাজনিত ঘটনায় বিশ্বব্যাপী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অনেকেই তাদের ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যেই রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান *স্পেসএক্স* ও ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাতা *টেসলা*-র উদ্যোক্তা এলন মাস্ক ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছেন। যার প্রত্যেকটি একাউন্টে অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ লক্ষ। এদিকে *অ্যাপল*-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক-ও ফেসবুক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। হলিউড-বলিউড তারকারাও তথ্য-নিরাপত্তার শঙ্কায় ডিলিট করছেন ফেসবুক একাউন্ট।

কারণ ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জারে দেয়া তথ্য বা ছবি আপনি ডিলিট করলেও তা ঠিকই সংরক্ষণ করছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৩ মার্চ ২০১৮
ইউএসএ টুডে, ৯ এপ্রিল ২০১৮

আসক্তির নতুন ফাঁদ অনলাইন শপিং

অনলাইন শপিং। বিশ্বজুড়ে এটি রূপ নিয়েছে আসক্তির এক নতুন ফাঁদে। এ কেনাকাটা এখন আর প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নেই, পৌঁছে গেছে আসক্তির পর্যায়ে। আধুনিক মানুষের ব্যস্ততাকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে চোখ ধাঁধাঁনো বিজ্ঞাপন আর ঘরে বসে পণ্য পাওয়ার অভিনব উপায়। এদিকে ইন্টারনেট-প্রযুক্তিকেও এমন 'স্মার্ট' (!) করে তোলা হয়েছে যে, ওয়েবসাইট ভিজিটের ধরন দেখেই বিজ্ঞাপনদাতারা বুঝে ফেলে আপনি কী চান। স্ক্রিনের সামনে চলে আসে একের পর এক পণ্যের মনোহারী বিজ্ঞাপন।

নতুন কেনা পণ্যটির ট্যাগ না খুলেই আরেকটি পণ্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্রেতারা। আর এ জন্যে দোকানেও যেতে হচ্ছে না। *সাইকোলজি টুডে*-র একটি রিপোর্টে (৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) পণ্যাসক্তিকে অ্যালকোহল আসক্তির সাথে তুলনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী ড. এপ্রিল বেনসন।

গ্রিনপিস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হংকংবাসী প্রতি বছর যে অতিরিক্ত পোশাক ফেলে দেয় তার পরিমাণ এক লক্ষ ১০ হাজার টন! অর্থাৎ জনপ্রতি ১৫ কেজি। এর অধিকাংশই ক্রেডিট কার্ড ও অনলাইনে কেনা এবং নিতান্তই চোখের ক্ষুধায়।

বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বর্তমানে এদেশে ফেসবুকসহ ওয়েবভিত্তিক অনলাইন শপ রয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি। বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার পণ্য কেনাবেচা হচ্ছে অনলাইনে!

এ যুগে পণ্য যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মানুষের অভাববোধ। অস্বাভাবিক পণ্যপ্রীতি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। তাই অনলাইনে পণ্য যতই আপনার হাতের নাগালে থাকুক, আসক্তির কানাগলিতে ঢুকে পড়ার আগেই সচেতন হোন।

তথ্যসূত্র : ডয়েচে ভ্যালে, ১৬ মে ২০১৭
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ৫ আগস্ট ২০১৭

আপনার করণীয়

বর্জন করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বিনোদনের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন না। ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন করুন।

রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন

প্রয়োজন ছাড়া রাত্রি জাগরণ ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাত ১১টার পর মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার-জাতীয় সকল গ্যাজেট বন্ধ রাখুন। সন্তান সারাক্ষণই রুমের দরজা বন্ধ করে রাখছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সন্তানের বন্ধু হোন, তাকে পরিবারের অংশ করে নিন

সন্তানকে বকাঝকা নয়, উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। আসক্ত হওয়ার মতো অবসর সময় যেন সন্তানের না থাকে। ভাইবোনের সাথে শেয়ার করতে শেখান তাকে। আপনিই হোন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মের শাশ্বত শিক্ষা মেনে চলুন

নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী নিয়মিত পাঠ করতে, অনুধাবনে ও অনুশীলনে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও অনুশীলন করুন।

আপনার সন্তানের রোল মডেল আপনিই

আপনার কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আপনি ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হলে সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। তাই আগে নিজে ফেসবুক বর্জন করুন, সন্তানকেও এ থেকে দূরে রাখুন।

১৮'র আগে স্মার্টফোন নয়

সন্তানের আবদার মেটাতে বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না। ঘরে শিশুরা থাকলে স্মার্ট টিভিকে না বলুন। কারণ কৌতূহলের বশে সে সহজেই ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

মেডিটেশনকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন

যেসব সঙ্গ আসক্তির কানাগলিতে ঠেলে দেয়, তাদের পরিত্যাগ করুন। পরিবারের সবাই মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার পারিবারিক মেডিটেশন করুন। সপরিবারে ফাউন্ডেশনের সাদাকায়ন, আলোকায়ন ও আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন।

এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায়

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ হতাশা-বিষণ্নতা-একাকিত্বের অনুভূতি হ্রাস করে। বাড়ায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা। তাই সাধ্যমতো নিবেদিত হোন সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে।

প্রযুক্তিদক্ষ হোন
ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে বাঁচুন!

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বর্ষবরণ সংস্করণ ১৪২৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd